ছবি

আইয়ুব আহমেদ দুলাল

ছেলেবেলা, কার না প্রাণ টানে ! যদি আবার ফিরে পেতাম ! এমন আকুতি সকলের। কিন্তু বিধাতার নিয়ম কি আর ভঙ্গ করা যায় ? যায় না। তবে সেই দিনগুলি ফিরে পাওয়া না গেলেও একটু চেষ্টা করলে কাছাকাছি যাওয়া যায়। আগের মত হয়ত হবে না, পুরানো জরাজীর্ন মনে হবে। সত্যিই সেই দিনগুলির কথা মনে হলেই স্মৃতির পাতায় লেখা অক্ষরগুলো ভেসে উঠে চোখের সামনে, মনের আয়নায়। দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে অজান্তে। কিংবা চোখ জলে ভিজে যায়। তেমনি এক ভাঁজ করা স্মৃতির পাতা ওপেন করে প্রায় আঠার বছর পর প্রাণের টানে গিয়েছিলাম আমার ছেলেবেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

আমাদের সময়কার সেই শিক্ষকগন সবাই নেই। মাত্র দুইজন আছেন। একজন অমল স্যার, আরেকজন আবুল হোসেন স্যার। আবুল হোসেন স্যার যুবক বয়সে এসে চাকুরীতে যোগ দিয়েছিলেন। এখনো আছেন। ভাবতে পারিনি যে, আমাদের কোন শিক্ষক এই স্কুলে এখনো আছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা হবে। ভেবেছিলাম আজিমপুর কবরস্থানের মত স্যারদের কর্মস্থলও উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে হয়ত একাধিক বার, বিভিন্ন স্থানে। এক একটি কর্মস্থল পরিবর্তন মনে অভিজ্ঞতা, পদোন্নতি এবং জীবন মান উন্নয়ন। কিন্তু না, এসে দেখি তেমন কিছু হয়নি। অন্য শিক্ষকদের কেউ কেউ কর্মস্থল পরিবর্তন করেছেন, কেউ অবসর নিয়েছেন। তাই দেখা হয়নি। অমল স্যারও অবসরের পথে। হয়ত শেষ দিকে এসে আর পরিবর্তনের চেষ্টা করেননি। কিন্তু আবুল স্যার এখনো কন্‌স্ট্যান্ট হয়ে আছেন। খুব ধৈর্য্যশীল বলতে হবে। কিংবা তিনি বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী নন। না কী পণ করে ঢুকেছেন, যেখান থেকে শুরু, সেখানেই শেষ করবেন।

তিনি যখন নুতন শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন তখন চমৎকার একটি ফিগার নিয়ে এসেছিলেন। ভলিবল ভাল খেলতেন। তবে অঙ্গ ভঙ্গি ছিল অন্যরকম। বল মারার আগে পজিশন নিতে গিয়ে তৃংবৃং করতেন। যা দেখে আমরা ঠোঁট চিপে হাসতাম। সেই ফিগার অবশ্যই এখন আর আগের মত নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ জীবনের সুর্য্য এখন হেলে পড়েছে। আকাশে থরে থরে জমে আসছে মেঘ। দীপ্তি নেই, ক্রমান্বয়ে ম্লান হয়ে আসছে। আগে সুদর্শন থাকলেও এখন আর সুদর্শন বলা যায় না। ব্যাচেলর থেকে পদত্যাগ করার পর সংসার আর সংগ্রামের ঘর্ষণে সু এখন আর দর্শন হয় না। চিকুর-নদী মন্থর। ঢেউ নেই, জোয়ার নেই, একদম চর পড়ে গেছে। ড্রেজিংয়েও আর কাজ হবে না। হাসিতে আগে মুক্তো ঝরতো। এখন ঝরে না। তবুও হাসেন। গতি শ্লথ হলেও হাসিতো আর বন্ধ রাখা যাবে না ! তবে মুক্তোর পরিবর্তে সেই হাসিতে এখন আতাফলের বিচি ঝরে। বয়সের ভাঁজ পড়েছে ত্বকে। ছেলেমেয়েরাও এখন অত্র স্কুলে লেখাপড়া করছে। তাই বলে স্মৃতি শক্তি, কিংবা দৃষ্টি শক্তি, অথবা স্নেহের সিন্দুকটা কিন্তু একেবারে খালি হয়ে যায়নি। আমাকে কষ্ট করে সামনে দাঁড়িয়ে নুতন করে পরিচয় দিতে হয়নি। নম্রভাবে বলতে হয়নি- স্যার, আমার নাম অমুক, আমি আপনার ছাত্র, প্রথম বেজের ছাত্র ছিলাম। কিংবা চেনা চেনা মনে হয়, তবু যেন চেনা নয়, এমন দৃষ্টিতেও তাকাতে হয়নি। দৃষ্টিগোচর হতেই অকৃপণভাবে তিনি বুকে টেনে নিলেন। উল্লেখ্য যে, আমরা ছিলাম ঐ স্কুলের প্রথম বেজ এবং স্যারদের অত্যন্ত প্রিয় ও স্নেহভাজন। তার প্রমাণ পাওয়া গেল দেয়ালে ঝুলানো ছবিটা দেখে। আমাদের বিদায়কালীন গ্রুপ ছবি। পুরানো হয়ে গেছে। ময়লা জমেছে। ফ্রেমগুলো কালো হয়ে গেছে। ভেতরের ছবিটা গ্লাসের সঙ্গে লেপ্টে আছে। তবুও নতুনের মত দেখা গেছে, জীবন্ত মনে হল। দেখেই পড়িমরি করে উঠে গেলাম। চোখ তুলে তাকালাম।

সহপাঠীদের ছবির দিকে তাকিয়ে আমি যেন পাথরের খাম্বা হয়ে গেলাম। কতগুলো দিন একসাথে কাটিয়েছি। লেখাপড়া করেছি। ভাল ফলাফল করার প্রতিযোগিতা করেছি। রেললাইন দিয়ে দৌঁড়ে স্যারের বাসায় প্রাইভেট পড়তে গিয়েছি। রেলের পাটিতে কান পেতে শুনেছি রেলগাড়ি আসছে কিনা। না আসলেও বলাবলি করেছি- রেল আসছে। তারপর দৌড়। গাড়ি আসার আগে আগেই পৌঁছাতে হবে স্যারের বাসায়।

পেছনে না তাকিয়ে বোগলে বই চেপে ভোঁ-দৌড়। কিশোর বয়স, এনার্জিও ভাল ছিল। এক দৌঁড়ে চলে গেলাম দেড় কিলোমিটার। ক্লাসে ক-তো খুঁনসুটি হতো। একই বেঞ্চে বসে ঠেলাঠেলি হতো এমনি এমনিই। একটাই ফ্যান ছিল ক্লাসে। সেই ফ্যানের নীচে বসার জন্য কার আগে কে এসে পৌঁছাবে সেই প্রতিযোগিতা হতো। স্যারের দেয়া প্রশ্নের উত্তর লিখে কে আগে খাতা জমা দেবে তার প্রতিযোগিতা হতো। কখনো সখনো ছোটখাট বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হতো। আমরা ক্লাস টেনে মোট ঊনত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী ছিলাম। তার মাঝে আবার গ্রুপিং হতো। এক থেকে সাত পর্যন্ত রোল ছিল আমাদের দখলে। আমরা ছিলাম উজ্জল গ্রুপ। আমাদের শারীরিক গঠন ছিল আন্ডারসাইজ। উজ্জল ফার্ষ্ট বয়। বাকী সব বাদল গ্রুপ। বাদল তাদের লিডার। উচ্চতায়ও তারা সব বড় বড়। জাতীয় সংসদের মত কাদা ছোড়াছুড়ি হতো আমাদের মাঝে। আমরা সরকারী দলের মত আচরন করতাম। তবে সুবিধা করতে পারতাম না। লেখাপড়ার জিতলেও অন্য সব বিষয়ে আমরা হেরে যেতাম। ক্লাসের বাইরে বিরোধে মেতে উঠতাম না, মাইর খাওয়ার ভয় ছিল। কারণ আমরা ছোট সাইজ। শক্তি কম। তাছাড়া আমাদের দলে কোন মেয়ের স্থান ছিল না। মেয়েরা ছিল ওদের দলে, আমাদের বিপক্ষে। কাজেই কোন ধরনের ট্রাইবুন্যালে মুখোমুখি হলে স্যার মেয়েদের কথাই বিশ্বাস করতেন। ফলে আমাদের বকুনি শুনতে হতো, কিংবা লঘু দন্ড হতো- কানমলা, অথবা একটা বেতের বাড়ি। বড় ধরনের দন্ড হতো না, কারণ মেধা ভিত্তিতে আমরা স্যারদের বিশেষ দৃষ্টিতে ছিলাম।

আমাদের সকল বিরোধের অবসান হয়ে ছিল এসএসসি পরীক্ষার ফর্ম পূরণের মধ্যদিয়ে। সকলের সিট পড়েছিল একের পিছে এক। আমরা সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে গিয়েছি। সবাই একসঙ্গে হলে গিয়ে মিলিত হয়েছি, আবার একসঙ্গে ফিরেছি। একজন একটা না পারলে চোখ কান খোলা রেখে চুপিচুপি তাকে সহযোগীতা করার চেষ্টা করেছি। পরীক্ষার আখেরী দিন আমরা গাড়িতে চড়িনি। অভিভাবকদের গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা সকলে একত্র হয়ে মহাসড়ক ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাড়ে তিন মাইল পায়ে হেঁটে এসেছি। পথে পথে কী যে বান্দ্রামী হয়েছে, তা আর কী বলবো !

আজ সবই স্মৃতির পাতায় বন্দী। সেই সব বন্ধুরা কোথায় ! কোথায় আমাদের সেই খুঁনসুটি ? কোথায় সেই প্রতিযোগিতা ? ক্ষনস্থায়ী। সবই ক্ষনস্থায়ী। মাঠে শিশিরে ভেজা দুর্বা ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে উড়িয়েছিলাম লাল সবুজ পতাকা। সারিবদ্ধভাবে পিটিতে দাঁড়ানো ছাত্রছাত্রীদের সামনে গেয়েছিলাম- আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। মনে পড়ে, একদিন আমরা উজ্জলসহ পাঁচ সহপাঠী পিটির সামনে গিয়ে স্যারদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিন খুব হাসাহাসি হয়েছিল। প্রত্যেকের সুর এবং কণ্ঠ বিকৃত শোনা গিয়েছিল। সুরবিহীন কেউ গেয়েছিল- আমার সোনার বাংলা, আবার কেউ কেউ কাঁপা কন্ঠে গেয়েছিল- আমার সোনা ব্যাংলা। শুনে খুব হাসি পেয়েছিল। গেতে গেতে হেসেছিলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিজ্ঞানের শিক্ষক জ্ঞানস্যার। তিনি সতর্ক সংকেত দিলেন। একবার। দুইবার। তবুও হাসি থামাতে পারিনি। তৃতীয়বার স্যার ক্রুদ্ধ হয়ে কষে ব্যান্ড বাজালের আমার গেঁড়ির উপর। বিদ্যুৎ স্পৃশ্যের মত ঝাঁকুনী দিয়ে শিরশির করে উঠল আমার আপাদমস্তকে সমস্ত শিরা-উপশিরা। ধাতস্থ হতেই ঈর্ষা হল। আমি কেন একা খাবো ? ভয় লাজ উপেক্ষা করে আমি বললাম- স্যার, শুধু আমাকেই মারলেন ? বলতে না বলতেই বাকীদের ঘাড়েও পড়ল চটাচট। সামনে আমাদের বন্ধুরা হাসতে হাসতে কাত চিৎ হয়ে পড়তে ছিল। ডান পাশে দাঁড়ানো ছিল মেয়েরা। তারাও মিটিমিটি হাসছিল। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। শেষের দিকে আমাদের গাওয়াটা খুব চমৎকার, শ্রুতিমধুর এবং সুর সম্পন্ন হয়েছিল। স্যার প্রশংসা করেছিলেন এবং ব্যান্ড বাজানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। মুলতঃ তিনি আমাদের কজনকে খুব বেশী পছন্দ করতেন। তিনি এমনিতেই খুব স্নেহপ্রবণ এবং মহানুভব ছিলেন। আমাদের অপারগতায় জমে থাকা প্রাইভেট পড়ার পারিশ্রমিক তিনি কোন কোন মাসে মাপ করে দিতেন। এটা ছিল আমাদের জন্য একটা বিশাল পাওয়া। জানি না, স্যার এখন কোথায় আছেন। হয়ত আর কখনো দেখা হবে না। জাতীয় সঙ্গীতও সেই ভাবে আর গাওয়া হবে না। কারণ সেই সোনালী সকাল এখন আর নেই। জীবন এখন সোনালী থেকে রুপালী হয়ে গেছে। ক্রমান্বয়ে একদিন হয়ে যাবে বাদামী। তারপর রক্তিম। সবশেষে ঘনিয়ে আসবে অমানিশা।

প্রতিটি পরিচিত মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের নামধাম মনে করার চেষ্টা করলাম। বাম থেকে ডান দিকে, আবার ডান থেকে বাম দিকে। একটি নামও ভুলিনি। প্রত্যেকের নাম মনে আছে। এত দ্রুত ভুলে যাওয়ার কথাও নয়। মনে হয় এখনো তারা আমার সহপাঠী হয়ে আছে। পেছনে তাকালেই হয়ত দেখা যাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। মাঠে গোল্লাছুট খেলছে ছেলেদের কেউ কেউ, কিংবা টেনিস বল দিয়ে বোম-বাষ্টিং খেলছে। আবার কেউ ক্লাসে বসে হই চই করছে। ছুঁয়ে মারছে এর পেন্সিল ওর কাছে, ওর ইরেজার এর কাছে। জুয়েলও ছুঁড়ে মেরেছিল একদিন। তবে পেন্সিল কিংবা ইরেজার নয়। সে মেরেছিল একটি সুয়েটার। নিজের অজান্তে। সুয়েটার ছিল বিপ্লবের। পেছন থেকে দুষ্টোমীর ছলে কেউ একজন ছুঁয়ে মেরেছিল। এসে পড়েছিল জুয়েলের সামনে। জুয়েল তখন কোন একটা নোট লিখতে ছিল। সুয়েটার বেঞ্চের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। সে কলমটা আঙ্গুলের চিপায় এঁটে ধরে বেঞ্চের নীচে নুঁয়ে পড়ে সুয়েটার তুলে আন্দাজে পেছনের দিকে ছুঁড়ে মারল। দুর্ভাগ্যক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটি গিয়ে পড়েছিল মেয়েদের টেবিলে। মেয়েরা কক্ কক্ করে মুরগীর মত লাফিয়ে উঠল। ধাতস্থ হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে পুশব্যাক করলেই পারতো। নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি হতো না। কিন্তু তা না করে তারা ঝড়সড় হয়ে মুখে ওড়না চেপে একপাশে সরে গিয়েছিল। স্পর্শও করেনি। যেন একটি নাপাক বস্তু। স্পর্শ করলে জাত যাবে। আধা মিনিটের মত পড়ে ছিল মেয়েদের বেঞ্চের উপর। লাজে পড়ে সাহস করে কেউ এগিয়ে যায়নি মেয়েদের দিকে। বয়ঃসন্ধিকালীন সময়তো, তাই সবাই লাজুক। এর মধ্যেই আবুল হোসেন স্যার এসে পড়লেন। ক্লাসে প্রবেশ করেই তিনি দেখতে পেলেন। দেখামাত্র কপাল কুঁচকে এলো নিমিষে। রাশভারী হয়ে গেলেন। ঘটনা জানতে চাইলেন এবং মুল ঘটনা জানতে গিয়ে জুয়েলের নামটিই বেশী হাইলাইট হল। স্যার রেগে গেলেন। আমরা তখন ভয়ে কচ্ছপের মত গুটিয়ে ছিলাম। আতঙ্কিত মন। ট্রাইবুনালে ফলাফল কী হয় কে জানে। ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না। সুনামী একটা বয়ে যাবে অনুমান করা যাচ্ছিল। তাই পুরো ক্লাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ক্লাস শেষে স্যার অফিসে ডেকে পাঠালেন। আমরা সবাই আতঙ্কিত, প্রকম্পিত। থঁর্থ করে কাঁপছি একেক জন। কান খাড়া করে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এসে বেজে উঠল। আরো বেশী আতঙ্কিত হলাম। ভয়ে শরীরটা র্শির্শি করে উঠল। হাতুড়ীর বাড়ি পড়তে লাগল বুকের ভেতর। সকলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ভয় ছিল, এর পর না জানি কার পালা ! শুরু হল ধুফুর ধাফুর শব্দ। জুয়েলের আর্তচিৎকার। স্যার বেদম প্রহার করলেন। শুধু শুধু। অথচ সে সম্পূর্ন নির্দোষ। আমরা জানি। কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিল না। আমরা অসহায়। অনুশোচনায় ভুগছিলাম। অনেকে কেঁদেই ফেলেছে। প্রিন্স হাউ মাউ করে কেঁদেছে। কারণ জুয়েল প্রিন্সের আপন ছোট ভাই। একই ক্লাসে পড়তো। জুয়েল নামে যেমন, পড়াশুনাও ছিল তেমন। প্রিন্সও মেধাবী, তবে জুয়েলের তুলনায় একটু কম।

জুয়েলের সামনের দাঁতগুলো উঁচু ছিল বিধায় আমরা তাকে দাঁতাল বলে ডাকতাম। সে একটুও রাগ হতো না। সেই জুয়েল এখন ডাক্তার। তবে দাঁতের ডাক্তার নয়, ডিএমসি থেকে এমবিবিএস করা জিপি। আর প্রিন্স হল একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার। ভাবতেই ভাল লাগে। উজ্জল তার পরিবারের মুখ উজ্জল করে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার হয়েছে। সে এমবিবিএস করেছে এমএমসি থেকে। বর্তমানে শিশু সার্জন পদে ঢাকা শিশু হাসপাতালে কর্মরত আছে। শাহীন ইলেকট্রনিক্সে ডিপ্লোমা করে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করছে। বেশ ভালই আছে। আমাদের গ্রুপের বাকী সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী।

বাদল গ্রুপের কেউ কেউ কলেজে উঠেই ঝরে পড়েছে। তবে অল্প বয়সে ব্যবসা করে অনেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কেউ কেউ পরিবারের সমর্থন পেয়ে এখন লাখপতি, কিংবা কোটিপতি। তম্মধ্যে বাদল, ফজলু, কবীর, আলতাপ উল্লেখযোগ্য। মিজান হয়েছে পুলিশ অফিসার। বাদশা বিজেএমসি'র শ্রমিক নেতা। জাহাঙ্গীর কলেজে ছাত্রমৈত্রী করতো। আমরাই প্রথম তাকে শ্রেনী সম্পাদক বানিয়েছিলাম। রাজনীতিতে সেই থেকে তার উত্থান। এখন সে কেন্দ্রিয় পর্যায়ের নেতা। মিলন এলাকার নামকরা মাস্তান। বিপ্লব একটা এনজিও'তে আছে। জাকির সরকারী কর্মকর্তা, আজ এখানে তো কাল ওখানে। ঘুরতে ঘুরতে তার সাথে মাঝে সাঝে দেখা হয়ে যায়।

মেয়েদের খোঁজ খবর অতোটা জানতে পারিনি। তবে ‘অনিতা পাল’ স্বপরিবারে ইন্ডিয়ায় পাড়ি দিয়ে ‘অনিতা মল্লিক’ হয়েছে। সেখানে মোটেও ভাল নেই। মানবেতর জীবন যাপন করছে। তল্পিতল্পাসহ দেশ ত্যাগ করার কারণে ফিরেও আসতে পারছে না। সুতরাং না পারছে গিলতে, না পারছে ফেলতে। তার প্রতি আর্শির্বাদ রইল।

সালমা, যেই মেয়েটি ক্লাসের সবচে খারাপ ছাত্রী, নকল বিহীন স্কুলে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। বোকা বোকা টাইপের সহজ সরল একটি মেয়ে। দরজা না লাগিয়ে ক্রিয়াক্রম সারতে গিয়ে ছেলেদের হাসির খোরাক হয়েছিল। সে এখন মেয়েদের মধ্যে সবচে ভাল অবস্থানে আছে। স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা।

রোজী আছে অষ্ট্রেলিয়ায়। ডিভি ভাগ্যবতী সাহিদা এখন আমেরিকায়। ডেইজী ইংল্যান্ডে। বেবী আছে ফ্রান্সে।

অন্যরা সকলেই সংসারী। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এতদিন কোন মেয়ে অবিবাহিত থাকতে পারে না। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আফরোজা সংসারী হতে পারেনি। কেন ? তা উপরওলাই জানে। তবে উপরওলা তার গায়ের রঙ ময়লা করে পাঠিয়েছেন। এটাই হয়ত প্রধান কারন। বর্তমানে কোন এক এনজিও‘তে কর্মরত আছে। আল্লাহ তার সুখী জীবন দান করুক।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম ফ্রেমের বাম পাশে এসে। ছবিতে আমরা তিন সারিতে দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা কজন সামনে বসা। মাঝের সারিতে মেয়েরা দাঁড়ানো। বাকী সব ছেলেরা পেছনে। মেয়েদের সারিতে বিনার পাশেই ছিল রুকসানা। আমাদের ক্লাসের সবচে ছোট্ট মেয়েটি। ছোট্ট বলতে তার শারীরিক গঠন ছিল ছোট। বেঁটে বলা যায়। একদিন স্যার শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন- ‘খর্বাকৃতি’ শব্দের অর্থ কি ? সে বলেছিল ‘বেঁটে’। উত্তরটা অবশ্যই সঠিক ছিল। তবে তার মুখ থেকে শোনার কারণে বিষয়টা হাসির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কয়েকদিন আগে জানতে পারলাম- আমাদের সেই ছোট্ট সহপাঠী বন্ধুটি আর নেই। অভিমান করে চলে গেছে অফেরার দেশে, যেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না। সেও আসবে না। প্রথম কয়েক বছর সে ছিল বিকৃত মস্তিস্কের মানষিক রোগী। চিকিৎসা হয়েছিল, গ্রাম্য ঝাড়ফুক। বলা যায় সুচিকিৎসা হয়নি। অবজ্ঞা আর অবহেলায় শেষমেষ বিনা চিকিৎসায় ইহলোক ত্যাগ করেছে। শুনে প্রচন্ড খারাপ লেগেছিল। ছবিতে দেখে মনে হয় না যে, অপচিকিৎসা কিংবা যতেœর অভাবে সে অভিমান করে আমাদের সহপাঠীর দল ছেড়ে চলে গেছে চিরতরে। অথচ এই আমরা, এইটুকুন বয়সে স্কুলে থাকতে ক-তো জনকে সহযোগিতা করেছি। কত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। কেউ একজন স্কুলে না এলে তার বাসায় গিয়ে খোঁজ নিয়েছি। অসুস্থ্য হলে দল বেধে সবাই গিয়েছি তাকে দেখতে, সাহস দিতে। পয়সার অভাবে অনেকে স্কুলড্রেস বানাতে পারেনি, আমরা চাঁদা তুলে সহযোগিতা করেছি। জুনিয়র যারা বই কিনতে পারেনি, বছর শেষে নিজের বইগুলো দিয়ে দিয়েছি। পিকনিকের টাকা যোগাড় করতে পারেনি, আমরা সংগ্রহ করে দিয়েছি এবং স্যারদের সহযোগিতায় অভিভাবকদের কনভার্ট করে ছাত্র ও ছাত্রী সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছি। কারো মন খারাপ হতে দেইনি, কাউকে ফেলে রেখে যাইনি। ক্লাসে আমরা দুটো দল থাকলেও এইসব ক্ষেত্রে ছিলাম একমত। তখন রুকসানাও আমাদের সাথে ছিল। সেও অন্যের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। অথচ সে আজ নেই। ভাবতে পারি না যে, সে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। আমরাও তাকে সহযোগিতা করতে পারিনি। আমরা জানতেও পারিনি। কীভাবে জানবো ? কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই জন্যই হয়ত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হয়। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকেও সবাই একত্র হতে পারে। সবাই সবাইকে দেখে, চেনে, ভালমন্দ জানে। আনন্দ পায়। পুরানো দিনগুলোকে কাছে পায়। সেই সুবাধে দুঃসময়ে একে অন্যের পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা তো পারছি না। আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন। কেউ কারো খোঁজ রাখি না। সবাই ব্যস্ত। কারো কারো জীবন অনেক সুখের, কারো দুখের। কারো পোয়াবারো, কেউ রাশভারী। অনেক উপরে উঠে গেছে কেউ কেউ। কথায় ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। পরিচয় দিলেও চিনতে চায় না। দুই মিনিট কথা বললেও মনে হয় তার দুই মিনিট লস হয়ে গেছে। আবার অনেকেই আমার মত, পরিচয় পেয়ে আনন্দ পায়। আবার ভুলেও যায়। আমি ভুলি না। সবাইকে আমার মনে পড়ে। আমি কম বেশী সকলের খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করি। বন্ধুরা বলে এটা নাকি আমার একটা বাড়তি গুন।

গুন কিনা জানিনা, তবে ভাল লাগে, আনন্দ পাই। হারানো দিনগুলোকে কাছে পাই। সামান্য সময়ের জন্য কিছুটা আনন্দ বলা যায়। অনেকেই বলে- কেন তুই এতো পেছনের দিকে ফিরে যাস্ ? কী লাভ ? এতে লস ছাড়া লাভ নেই। পৃথিবী এখন অগ্রগামী। ঘোড়ার মত ছুটছে সামনের দিকে। তুইও আগে বাড়, ইমোশন ছাড়। কই, অন্যরাতো তোর খোঁজখবর নেয় না ? আমি বলি- না নিক, তাতে কী ! আমি নেই। আমার ভাল লাগে, আমি আনন্দ পাই।

ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে আমি হারিয়ে গেলাম পুরানো দিনে। মনে হয়েছে যেন আমি এখনো ঐ স্কুলে ছাত্র। আমার সাথে আছে আমার সকল সহপাঠী। আমি আপন মনে ছুটছি, খেলাধুলা করছি। কোন ঝামেলা নেই। ছোট্ট এই মস্তিস্কে কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, অস্থিরতা নেই। শুধু লেখাপড়া আর খেলাধুলা। মহা সুখেই তো আছি---। হঠাৎ ধোঁয়াশা মনে হল। চোখের পাতা মুদে এলো। ছবির উপর থেকে সরিয়ে নিলাম দৃষ্টি। অজান্তেই নেমে এলো দীর্ঘশ্বাস।

আইয়ুব আহমেদ দুলাল
সৌদি আরব।